বাংলার ইতিহাস: আফগান ও মুঘল শাসন (১৫৩৮-১৭০৭ খ্রি.)

ইউনিট ৬

ভূমিকা:

হোসেন শাহী বংশের পতনের পর বাংলায় আফগান কর্‌রাণীদের শাসন সূচনা হয়েছিল। রাজমহলের যুদ্ধে কর্‌রাণী রাজবংশের শেষ শাসক দাউদ খান কর্‌রাণীকে পরাজিত করে ১৫৭৬ খ্রি. বাংলায় মুঘল সুবাদারি শাসনের যাত্রা শুরু হলেও মুঘলদের এ রাজ্য শাসন কেবলমাত্র রাজধানী ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এ সময় বাংলার নানা প্রান্তে কতিপয় মুসলিম ও হিন্দু জমিদার স্বাধীনভাবে শাসন কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। এ সকল স্বাধীন জমিদারগণ 'বার ভূঁইয়া' নামে পরিচিত ছিলেন। বাংলার এ জমিদারগণ মুঘল সম্রাটদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন যদিও পরবর্তীকালে মুঘলদের হাতেই এঁদের পতন সাধিত হয়েছিল। বাংলার ইতিহাসে তাই 'বার ভূঁইয়া'রা অমর আসনে আসীন হয়ে রয়েছেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ১ ঃ বাংলায় আফগান শাসন
পাঠ- ২ ঃ কর্‌রাণী বংশ
পাঠ- ৩ ঃ বার ভূঁইয়া: পরিচয়, কার্যক্রম ও মুঘলদের সাথে সম্পর্ক
পাঠ- ৪ ঃ বাংলায় মুঘল সুবাদারি শাসন
পাঠ- ৫ ঃ মুঘল শাসনামলে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

পাঠ-৬.১ বাংলায় আফগান শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলায় আফগানদের শাসন কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- আলোচ্য পাঠে আফগানও মুঘলদের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে জানতে পারবেন এবং
- বাংলায় কর্‌রাণী শাসন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট জানতে পারবেন।

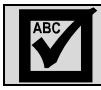	**মূখ্য শব্দ**	**শের খান, জান্নাতাবাদ, চৌসার যুদ্ধ ও পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ**

ভূমিকা

বাংলায় হোসেনশাহী শাসনের শেষদিক থেকেই মুঘল সম্রাট বাবর ও তাঁর পুত্র হুমায়ুন বাংলাকে মুঘল অধিকারে আনার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু আফগানদের কারণে মুঘলদের এ উদ্দেশ্য প্রথম দিকে সফল হয়নি। সাসারাম-অঞ্চলের জায়গিরদার আফগান নেতা শের খান শূরের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন মুঘল সম্রাট হুমায়ুন। এ সময় বিহারের জায়গিরদার জালাল খান নাবালক বলে তাঁর অভিভাবকের দায়িত্বও শের খান গ্রহণ করেন। সমগ্র ভারতের অধিপতি হওয়ার ইচ্ছা ছিল শের খানের। তাই গোপনে তিনি নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকেন। এ লক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে শের খান শক্তিশালী চুনার দুর্গ ও বিহার অধিকার করেন। তিনি ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে দু'বার বাংলার রাজধানী গৌড় আক্রমণ করেন। এবার সতর্ক হন দিল্লির মুঘল সম্রাট হুমায়ুন। তিনি শের খানের পিছু ধাওয়া করে বাংলার রাজধানী গৌড় অধিকার করে নেন। গৌড়ের চমৎকার প্রাসাদ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে হুমায়ুন এর নামকরণ করেন 'জান্নাতাবাদ'। সম্রাট গৌড়ে ৬ মাস আমোদ ফূর্তিতে গা ভাসিয়ে দেন। এ সুযোগে শের খান নিজের শক্তি বাড়াতে থাকেন। দিল্লি থেকে খবর আসে হুমায়ুনের সৎভাই হিন্দাল সিংহাসন দখল করার ষড়যন্ত্র করছেন। এ খবর পেয়ে হুমায়ুন দিল্লির দিকে যাত্রা করেন। এ সুযোগ কাজে লাগান শের খান। তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন বক্সারের নিকট চৌসা নামক স্থানে। গঙ্গা নদীর তীরে এ স্থানে হুমায়ুন পৌঁছালে শের খান তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অপ্রস্তুত হুমায়ুন পরাজিত হন (১৫৩৯ খ্রি.)। মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে শের খান 'শের শাহ' উপাধি নেন। তিনি বিহারে নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপর তিনি বাংলার দিকে দৃষ্টি দেন। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে মুঘল শাসনকর্তা আলী কুলিকে পরাজিত করে তিনি বাংলা দখল করেন। এ বছরই তিনি হুমায়ুনকে কনৌজের নিকট বিলগ্রামের যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন। এর ফলে দীর্ঘদিন পর বাংলা আবার দিল্লির শাসনে চলে আসে। চট্টগ্রাম ও সিলেট পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশ শের শাহের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। শের শাহ শূর বংশীয় ছিলেন বলে এ সময়ের বাংলার শাসন শূর আফগান বংশের শাসনকাল হিসেবে পরিচিত।

শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জালাল খান 'ইসলাম খান' নাম ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আট বছর (১৫৪৫-১৫৫৩ খি.) রাজত্ব করেন। কিন্তু ইসলাম খানের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র ফিরুজ খানের সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে শূর বংশের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দলাদলি শুরু হয়। শের খানের ভাগ্নে মুবারিজ খান ফিরুজ খানকে হত্যা করে 'মুহম্মদ আদিল' নাম ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে বসেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘটনাবলী হতে এ সময় বাংলা বিচ্ছিন্ন ছিল না। তাই ইসলাম খানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার আফগান শাসক মুহম্মদ খান সূর স্বাধীনতা ঘোষণা করে 'মুহম্মদ শাহ শূর' উপাধি ধারণ করেন। এ সময় হতে পরবর্তী কুড়ি বছর পর্যন্ত বাংলা স্বাধীন ছিল। মুহম্মদ শাহ সূর উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে মুহম্মদ আদিল শাহ শূরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। তিনি জৌনপুর জয় করে আগ্রার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। মুহম্মদ শাহ সূর নিহত হলে দিল্লির বাদশাহ আদিল শাহ শাহবাজ খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মুহম্মদ শাহের পুত্র খিজির খান তখন এলাহাবাদে অবস্থান করছিলেন। পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ' উপাধি গ্রহণ করে

নিজেকে বাংলার স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। কিছুদিন পর তিনি শাহবাজ খানকে পরাজিত করে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন।

এ সময় দিল্লির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নানা কারণে পরিবর্তন ঘটছিল। শের শাহের বংশধরদের দুর্বলতার সুযোগে মুঘল বাদশাহ হুমায়ূন স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু দিল্লিতে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলায় তিনি মুঘল আধিপত্য বিস্তার করার সুযোগ পেলেন না। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আকবর দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করে শূর বংশীয় আফগান নেতৃবৃন্দকে একে একে দমন করার জন্য অগ্রসর হলেন। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬ খ্রি.) আদিল শাহের সেনাপতি হিমু মুঘল সৈন্যদের নিকট পরাজিত ও নিহত হন। আদিল শাহ বাংলার দিকে পলায়ন করলেন। পথিমধ্যে তিনি সুরুজগড়ের নিকটবর্তী ফতেহপুরে সুলতান গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহের সঙ্গে এক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন (১৫৫৭ খ্রি.)।

বাংলা বিজয়ী আফগান সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ জৌনপুরের দিকে অগ্রসর হলে মুঘল সেনাপতি খান-ই-জামান তাঁর গতিরোধ করেন। কূটকৌশলী বাহাদুর শাহ খান-ই-জামানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর তিনি বাংলার বাহিরে আর কোনো অভিযান প্রেরণ করেননি। ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা জালালউদ্দীন শূর 'দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দীন' উপাধি গ্রহণ করে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও তাঁর ভ্রাতার ন্যায় মুঘলদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলতেন। ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে তাঁর একমাত্র পুত্র বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁর নাম জানা যায়নি। মাত্র সাত মাস রাজত্ব করার পর তৃতীয় গিয়াসউদ্দীন নামে জনৈক আফগান দলনেতা তাঁকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তিনিও বেশি দিন রাজত্ব করতে পারেননি। কররাণী বংশীয় তাজ খান কররাণী গিয়াসউদ্দীনকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	**বাংলার আফগান ও শের খানের সম্পর্ক একটি চার্টে তুলে ধরুন।**

সারসংক্ষেপ :

বাংলা সম্পদশালী হওয়ায় সর্বদা এ অঞ্চল বিদেশিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এরই ধারাবাহিকতায় হোসেন শাহী শাসনের পতন যুগে বাংলা শক্তিশালী মুঘল ও শের শাহীদের শ্যেণ নজরে পড়ে। মুঘল সম্রাট বাবুর ও আফগান উচ্চাভিলাষী শের খান উভয়ই বাংলা দখলের চেষ্টা করে প্রথম দিকে ব্যর্থ হয়। এরপর সম্রাট হুমায়ুন বাংলা দখল করে একে জান্নাতাবাদ নামকরণ করেন। অন্যদিকে শের খান সুযোগ বুঝে দিল্লিতে ফেরার পথে হুমায়ুনকে আক্রমণ ও পরাজিত করে বাংলা দখল করেন। পরবর্তীতে শের শাহের উত্তরাধিকারী নাবালক ফিরোজ খানের শাসনামলে দলাদলি শুরু হলে দিল্লির শাসন দূর্বল হয়ে পড়ে এই সুযোগে বাংলার আফগান কর্‌রাণীরা শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কে বাংলার রাজধানী গৌড়ে দুইবার আক্রমণ পরিচালনা করেন?
ক. শের খান খ. সম্রাট বাবুর গ. সম্রাট হুমায়ুন ঘ. সম্রাট আকবর

২। বাংলাকে 'জান্নাতাবাদ' নামকরণ করেন-
ক. সম্রাট বাবুর খ. সম্রাট হুমায়ুন গ. সম্রাট আকবর ঘ. ঈসা খান

৩। আদিল শাহের বিখ্যাত সেনাপতির নাম কি?
ক. বৈরাম খান খ. রাজা মানসিংহ গ. মীর জুমলা ঘ. হিমু

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

টিভিতে হিস্ট্রি চ্যানেলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ এবং এর চলমান সমস্যাবলী নিয়ে একটি প্রতিবেদন চলছিল তা দেখে রাফি তার বাবাকে প্রশ্ন করে যে, বাবা মধ্যপ্রাচ্যে বিদেশি শক্তিসমূহের এত প্রভাব কেন? কেনই বা বিদেশীরা এখানে সবসময় আস্তানা গড়তে চায়? জবাবে বাবা বলেন, এখানকার সমৃদ্ধি, তেল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ধর্মীয় অবস্থানের কারণেই এখানে সর্বদা বিদেশিরা আস্তানা গড়তে চায়।

ক. কে বাংলার নাম 'জান্নাতাবাদ' করেন? ১

খ. বাংলায় বিদেশী শক্তিবর্গ সর্বদা অক্রমণ করেছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসনাঞ্চলের সাথে বাংলার কোন সময়কার শাসনের মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. উক্ত শাসনামলে পরিস্থিতি বিশ্লেষণপূর্বক বাংলায় কররাণী রাজবংশ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ণনা করুন। ৪

পাঠ-৬.২ কররাণী বংশ(১৫৬৪-১৫৭৬ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলায় কর্‌রাণীদের শাসন কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- মুঘল ও কর্‌রাণীদের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে জানতে পারবেন ও
- বাংলায় মুঘল সুবাদারি শাসন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট জানতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**কররাণী, সুলায়মান খান কর্‌রাণী, দাউদ খান কর্‌রাণী ও রাজমহলের যুদ্ধ**

কর্‌রাণীদের পরিচয়

দিল্লি ও বাংলায় শূর রাজবংশের পতনের সুযোগে পশতুন রক্তধারার আফগান জাতিভুক্ত কররাণী গোত্রের তাজ খান কর্‌রাণী কর্তৃক ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় কর্‌রাণী রাজবংশের যাত্রা শুরু হয়। তাজ খান শেরশাহের অধীনে অমাত্য হিসেবে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন শুরু করেন (১৫৬২-১৫৬৪ খ্রি.) এবং পরবর্তীতে মুহম্মদ শাহের পরাজয়ের পর তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বিহার ও পশ্চিম বাংলা দখল করে নেন এবং পরবর্তীতে সোনারগাঁ দখল করে রাজধানী হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। তাজ খান কর্‌রাণী (১৫৬৪-১৫৬৬ খ্রি.) কর্তৃক এ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হলে পরবর্তীকালে সুলাইমান খান কর্‌রাণী (১৫৬৬-১৫৭২ খ্রি.), বায়েজিদ খান কর্‌রাণী (১৫৭২-জুন ১৫৭২ খ্রি.), দাউদ খান কর্‌রাণী (জুলাই ১৫৭২-১৫৭৬ খ্রি.) কর্‌রাণীদের শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সেনাপতি মুনিম খানের আক্রমণে রাজমহলের যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এ বংশের শাসনের সমাপ্তি ঘটে।

তাজ খান কর্‌রাণী (১৫৬৪-১৫৬৬ খ্রি.)

তাজ খান কর্‌রাণী প্রাথমিককালে শেরশাহের একজন কর্মচারী ছিলেন। কনৌজের যুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য শেরশাহ তাঁকে বিহারে জায়গীর প্রদান করেন। ইসলাম শাহের শাসনামলে তিনি সেনাপতি ও রাজনৈতিক পরামর্শদাতা হিসেবে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর তার নাবালক পুত্র ফিরোজ শাহের রাজত্বকাল তাজ খান উজির পদে নিয়োগ পান। ফিরোজ-এর মামা আদিল শাহ শূর ভাগ্নে ফিরোজকে হত্যা করে সিংহাসনে আসীন হলে ১৫৫৭ খিস্টাব্দে তাজ খান কর্‌রাণী পালিয়ে বিহারে আসেন এবং তিনি বাংলার সুলতান বাহাদুর শাহ শূরের নিকট নামমাত্র বশ্যতা স্বীকার বিহারের শাসন ক্ষমতা দখল করেন। তিনি ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ-পূর্ব বিহার ও পশ্চিম বাংলা জয় করে স্বাধীন কর্‌রাণী বংশের শাসনের সূচনা করেন। এরপর সুযোগ বুঝে মুহম্মদ শাহী বংশের শেষ সুলতান তৃতীয় গিয়াসউদ্দিন শাহকে পরাজিত ও হত্যা করে গৌড় দখল করে বাংলায় কররাণীদের অবস্থানকে সুসংহত করেন। এভাবে তাজ খান কর্‌রাণী বাংলায় স্বাধীন কর্‌রাণী রাজবংশের শাসনের সূত্রপাত করেন।

সুলাইমান খান কর্‌রাণী (১৫৬৬-১৫৭২ খ্রি.)

ভ্রাতা তাজ খানের মৃত্যুর পর সুলাইমান খান কর্‌রাণী এ বংশের শাসন নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি এ বংশের সবচেয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন শাসক ছিলেন। সুলায়মান কর্‌রাণী বিজ্ঞ উজির লোদী খানের পরামর্শে মুঘল সম্রাট আকবরের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলছিলেন। এ দক্ষ শাসক কৌশলে আফগান নেতাদের তাঁর দলভুক্ত করেন। এভাবে বাংলা ও বিহারের অধিকাংশ এলাকা তাঁর অধিভুক্ত হয়। উড়িষ্যাতেও তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি গৌড় থেকে রাজধানী তাণ্ডা বা তাঁড়া শহরে স্থানান্তর করে প্রশাসনিক উৎকর্ষ সাধনের দিকে নজর দেন। সুলাইমান এ লক্ষে পুত্র বায়েজিদ ও সেনাপতি কালাপাহাড়ের নের্তৃত্বে ১৫৬৮ উড়িষ্যার গজপতি শাসক মুকুন্দ দেবের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে পুরী সহ সমগ্র উড়িষ্যা দখল করে লোদী খানকে উড়িষ্যা ও কুতলু খান লোহানীকে পুরীর গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন। ১৫৭২ খিস্টাব্দে সুলায়মান কর্‌রাণীর মৃত্যু হয়।

বায়েজিদ খান কর্‌রাণী (১৫৭২-জুন ১৫৭২ খ্রি.)

১৫৭২ খিস্টাব্দে সুলায়মান কর্‌রাণীর মৃত্যু হলে পুত্র বায়েজিদ সিংহাসনে বসেন। ক্ষমতায় বসেই তিনি মুঘলদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু মাত্র কয়েকমাস শাসনের পরেই হানসু নামে তাঁর এক আত্মীয় এ অত্যাচারী সুলতানকে হত্যা করেন।

দাউদ খান কর্‌রাণী (জুলাই ১৫৭২-১৫৭৬ খ্রি.)

এবার সিংহাসনে বসেন সুলায়মান কররাণীর দ্বিতীয় পুত্র দাউদ কররাণী। তিনিই ছিলেন বাংলায় শেষ আফগান শাসক। দাউদ কররাণী খুব অদূরদর্শী শাসক ছিলেন। বিশাল রাজ্য ও ধন ঐশ্বর্য দেখে তিনি নিজেকে সম্রাট আকবরের সমকক্ষ ভাবতে থাকেন। এতো দিন বাংলা ও বিহারের আফগান শাসকগণ প্রকাশ্যে মুঘল সম্রাটের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়া থেকে কৌশলে বিরত থাকতেন। কিন্তু দাউদ স্বাধীন সম্রাটের মতো সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন এবং নিজ নামে খুৎবা পাঠ করেন ও মুদ্রা জারি করেন।

রাজমহলের যুদ্ধ ও কর্‌রাণীদের পরাজয়

আফগানরা এমনিতেই ছিল মুঘলদের শত্রু। তার ওপর বাংলা-বিহার মুঘলদের অধিকারে না থাকায় সম্রাট আকবরের স্বস্তি ছিল না। দাউদ কররাণীর আচরণ আকবরকে বাংলা আক্রমণের সুযোগ করে দিল। প্রথমে আকবর জৌনপুরের শাসনকর্তা মুনিম খানকে নির্দেশ দেন কররাণী রাজ্য আক্রমণ করতে। প্রথমদিকে মুনিম খান সরাসরি আক্রমণ করেননি। উজির লোদি খানের পরামর্শে মুনিম খানের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। দাউদ খান উজির লোদির পরামর্শে মুনিম খানের সাথে ধনরত্ন দিয়ে আপোস করেন। কিন্তু অচিরেই এ অবস্থার পরিবর্তন হয়। দাউদ কিছু ষড়যন্ত্রকারীর পরামর্শে উজির লোদিকে ভুল বোঝেন। দাউদের নির্দেশে তাঁকে হত্যা করা হয়। লোদির বুদ্ধির কারণেই এতোদিন মুঘল আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল বাংলা ও বিহার। মুনিম খানের আর বাঁধা রইল না। লোদির মৃত্যুর পর মুনিম খান ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে বিহার থেকে আফগানদের হটিয়ে দেন। আফগানরা ইতোমধ্যে নিজেদের ভেতর বিবাদ করে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এ সুযোগে মুনিম খান বাংলার দিকে অগ্রসর হন। কর্‌রাণীদের রাজধানী ছিল তাণ্ডায়। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে মুনিম খান আক্রমণ করলে বিখ্যাত তুকারাই-এর যুদ্ধে আফগানরা পরাজিত হয়ে তাণ্ডা ছেড়ে পিছু হটে। আশ্রয় নেয় হুগলি জেলার সপ্তগ্রামে। রাজধানী অধিকার করে মুঘল সৈন্যরাও অগ্রসর হয় সপ্তগ্রাম-এ। দাউদ খান পালিয়ে যান উড়িষ্যায়। মুনিম খান তাণ্ডার পরিবর্তে গৌড়ে মুঘল রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় গৌড়ে প্লেগ রোগ দেখা দিলে মুনিম খানসহ অনেক মুঘল সৈন্য এ রোগে মারা যান। ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এঅবস্থার সুযোগে দাউদ কররাণী পশ্চিম ও উত্তর বাংলা পুনরায় অধিকার করে নেন। অন্যদিকে ভাটি অঞ্চলের জমিদার ঈসা খান পূর্ব বাংলা থেকে মুঘল সৈন্যদের হটিয়ে দেন। মুঘলদের বিরুদ্ধে শুরু হয় নতুন এক প্রতিরোধ পর্ব।

ঈসা খান

মুনিম খানের মৃত্যু সংবাদ আগ্রায় পৌঁছালে সম্রাট আকবর বাংলার শাসনকর্তা করে পাঠান খান-ই-জাহান হোসেন কুলী খানকে। তাঁর সহকারী নিযুক্ত হন রাজা টোডরমল। দাউদ কর্‌রাণী কালা পাহাড়, কুতলু খান এবং জুনায়েদ খানের সহযোগিতায় বাংলার প্রবেশপথ রাজমহলে মুঘল সৈন্যদের বাঁধা দেন। মুঘলদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন বিহারের শাসনকর্তা মুজাফ্‌ফর খান তুরবাতি। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে ১২ জুলাই রাজমহলের নিকট মুঘল ও আফগানদের মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ হয়। রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ কর্‌রাণীর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। পরে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এভাবে বাংলায় কর্‌রাণী আফগান শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুঘল শাসনের সূত্রপাত হয়। অবশ্য 'বার ভূঁইয়াদের' নেতা ঈসা খানের প্রতিরোধের মুখে বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা আরো ত্রিশ বছর প্রলম্বিত হয়েছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	**রাজমহলের যুদ্ধের স্থান চিহ্নিত করে একটি মানচিত্র তৈরি করুন।**

সারসংক্ষেপ :

বাংলার ইতিহাসে শূর বংশের শাসনের মধ্যে থেকে আফগান কর্‌রাণীদের উত্থান একটি অভূতপূর্ব অধ্যায়। কর্‌রাণীরা শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে মোট ৪জন শাসক বাংলার সুলতান হিসেবে পররাক্রমশালী মুঘলদের বিরুদ্ধে কখনও কৌশলে আবার কখনও অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এরই ধারায় ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে মুঘল সেনাপতি হোসেন কুলীর কাছে শেষ কর্‌রাণী সুলতান দাউদ খান কর্‌রাণী পরাজিত ও নিহত হলে বাংলায় এ রাজ শাসনের সমাপ্তি ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কর্‌রাণী বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি?
ক. তাজ খান কর্‌রাণী খ. সুলাইমান খান ক্‌ররাণী গ. বায়েজিদ খান ক্‌ররাণী ঘ. দাউদ খান কর্‌রাণী

২। কোন কর্‌রাণী শাসক 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করেন?
ক. তাজ খান কর্‌রাণী খ. সুলাইমান খান ক্‌ররাণী গ. বায়েজিদ খান ক্‌ররাণী ঘ. দাউদ খান কর্‌রাণী

৩। কত খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
ক. ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে গ. ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

বগুড়ার মহাস্থানগড়ে শিক্ষা সফরে গিয়ে সোহাগ লক্ষ্য করে যে, এখানকার ভৌত-অবকাঠামো প্রায় সব ধ্বংসপ্রাপ্ত। তিনি এ বিষয়ে শিক্ষককে প্রশ্ন করলে শিক্ষক বলেন, কালের অকাল গ্রাসে অনেক শাসক বংশের কোন চিহ্নও বিদ্যমান নেই। মধ্যযুগে বাংলার ইতিহাসেও একটি রাজবংশের শাসনের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁদের কোন স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না।

ক. কর্‌রাণীদের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি? ১
খ. কর্‌রাণীরা কিভাবে বাংলায় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন? ২
গ. উদ্দীপকে ঈঙ্গিতকৃত শাসকবংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাসকের শাসন কৃতিত্ব নির্ণয় করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকবংশের সাথে মুঘলদের সংঘর্ষের বিবরণ দাও। এতে মুঘলদের জয়ের কারণসমূহ নির্দেশ করুন। ৪

পাঠ-৬.৩ বার ভূঁইয়াঃ পরিচয়, কার্যক্রম ও মুঘলদের সাথে সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বার ভূঁইয়াদের পরিচয় জানতে পারবেন।
- বারভূঁইয়া নেতা ঈসা খান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বার ভূঁইয়া ও মুঘলদের মধ্যকার দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক বিষয়ে জানতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**বার ভূঁইয়া, ঈশা খান, মসনদ-ই-আলা, ইসলাম খান ও বিক্রমাদিত্য**

বার ভূঁইয়াদের পরিচয়

'বার ভূঁইয়া' শব্দটি বাংলার ইতিহাসে খুবই পরিচিত একটি নাম। এর আক্ষরিক অর্থ বারো জন প্রধান বা বারো জন জমিদার হলেও মূলত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে শাসন কার্যক্রম পরিচালনাকারী সকল স্বাধীন জমিদারগণই একত্রে 'বার ভূঁইয়া' নামে পরিচিত ছিলেন। বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হলে সুলতানগণ কর্মের পুরস্কার এবং ইজারা দায়িত্ব হিসেবে নানা জায়গীর লাভ করে। পরবর্তীকালে রাজস্ব আদায়কারী এ সকল ইজারাদার ও কর্মচারীদের বংশধরগণ জমিদার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এ জমিদারগণ স্বাধীনভাবে জমিদারী কার্যক্রম পরিচালনাকালে মুঘলদের সাথে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বৈরি সম্পর্ক তৈরি হলেই মূলত এরা ইতিহাসের পাতায় উঁচু স্থান লাভ করে। মধ্যযুগে বাংলায় অবস্থানকৃত বার ভূঁইয়াদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

বার ভূঁইয়াদের নাম	এলাকার নাম
ঈসা খান, মুসা খান	ঢাকা জেলার অর্ধাংশ, প্রায় সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা এবং পাবনা, বগুড়া ও রংপুর জেলার কিছু অংশ।
চাঁদ রায় ও কেদার রায়	শ্রীপুর (বিক্রমপুর, মুন্সীগঞ্জ)
বাহাদুর গাজী	ভাওয়াল(ময়মনসিংহ, গাজীপুর ও ঢাকা)
সোনা গাজী	সরাইল (ত্রিপুরার উত্তর সীমায়)
ওসমান খান	বোকাইনগর (সিলেট)
লক্ষণ মাণিক্য	ভুলুয়া (নোয়াখালী)
পরমানন্দ রায়	চন্দ্রদ্বীপ (বরিশাল)
বিনোদ রায়, মধু রায়	চান্দপ্রতাপ (মানিকগঞ্জ)
মুকুন্দরাম, সত্রজিৎ	ভূষণা (ফরিদপুর)
রাজা কন্দর্পনারায়ণ, রামচন্দ্র	বরিশাল জেলার অংশ বিশেষ

বাংলায় বার ভূঁইয়াদের কার্যক্রম ও মুঘলদের সাথে সম্পর্ক

সোনারগাঁয়ের ঈসা খান

বাংলার বার ভূঁইয়াদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন সোনারগাঁয়ের ঈসা খান। তাঁর পিতা কালিদাস গজদানী ষোড়শ শতাব্দিতে ভারতের রাজপুতনা থেকে বাংলায় এসে বাণিজ্য শুরু করেন এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে সুলাইমান নাম ধারণ করে সোনারগাঁয়ের জমিদারী লাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ঈসা খান সোনারগাঁয়ে রাজধানী এবং খিজিরপুর, এগারসিন্ধু ও জঙ্গলবাড়িতে দুর্গ স্থাপন করে নিজের অবস্থানকে সুসংহত করেন। বর্তমান ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, কুমিল্লা জেলার অধিকাংশ এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা নিয়ে তাঁর জমিদারী ছিল। মুঘলদের হাতে দাউদ খান কররাণীর মৃত্যুর পর তিনি বার ভূঁইয়াদের নের্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং কৌশলে প্রভাবশালী জমিদার হিসেবে আবির্ভূত হন। রাজমহলের যুদ্ধে জয়ী হয়ে মুঘলরা বাংলার জমিদারদের বশ্যতা স্বীকারের জন্য আহবান জানান কিন্তু ঈশা খানের নের্তৃত্বে বারো ভূঁইয়া জমিদারগণ এ আহবানে সাড়া দেননি। এমতাবস্থায় ঈশা খানের বিরুদ্ধে সুদক্ষ সেনাপতিগণের নের্তৃত্বে

অনেকগুলো অভিযান পরিচালিত হয়। সম্রাট আকবর সেনাপতি খান-ই-আযম ও পরে শাহবাজ খানকে প্রেরণ করেন কিন্তু আশানুরূপ সাফল্যলাভে ব্যর্থ হলে বিখ্যাত সেনাপতি মানসিংহকে বাংলায় প্রেরণ করেন। কিন্তু রাজা মানসিংহও ঈশা খানকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হন। অবশ্য শেষ জীবনে তিনি শর্তাধীনে সম্রাট আকবরের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং এজন্য সম্রাট কর্তৃক 'মসনদ-ই-আলা' উপাধি লাভ করেন। ঈসা খানের মৃত্যুর (১৫৯৯ খ্রি.) পর তাঁর পুত্র মুসা খান বার ভূঁইয়াদের নের্তৃত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় দিল্লিতে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর ক্ষমতাসীন হলে মুঘল-বার ভূঁইয়া সম্পর্ক আবারো তিক্ত রূপ ধারণ করে। জাহাঙ্গীর ঢাকার সুবাদার ইসলাম খানকে মুসার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কয়েকটি যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে মুসা খান পরাজিত হয়ে বন্দি এবং পরে নিহত হন।

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য

ষোড়শ শতকের শেষভাগে বাংলার আরেকজন প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য। তিনি পিতা শ্রী হরির মৃত্যুর পর জমিদারী লাভ করে স্বাধীনভাবে শাসন কার্যক্রমের সূচনা করেন। কর্‌রাণী শাসক দাউদ খানের মৃত্যুর পর 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করেন এবং যমুনা ও ইছামতি নদীর সঙ্গমস্থল ধর্মাটে রাজধানী স্থাপন করে নিজের অবস্থানকে সুসংহত করেন। মুঘলরা তাঁকে দমনের জন্য অগ্রসর হলে সেনাপতি মানসিংহের সাথে তাঁর কয়েকটি যুদ্ধ হয় এবং সেনাপতি উসমান খানের দৃঢ়তা সত্ত্বেও তিনি পরাজিত ও বন্দি হন। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে মানসিংহের কাছে পরাজিত ও বন্দি হলে তাঁকে আগ্রায় প্রেরণ করা হয়। কিন্তু পথিমধ্যে বেনারসে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিক্রমপুরের কেদার রায়

বার ভূঁইয়াদের মধ্যে অন্যতম প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন রাজা কেদার রায়। ১৫৮৯ খ্রি. জমিদার চাঁদ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই কেদার রায় বিক্রমপুরের ভূঁইয়া জমিদার হিসেবে শাসন শুরু করেন। তাঁর রাজধানী ছিল বর্তমান মুন্সিগঞ্জের শ্রীপুর। তিনি মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের নিজ নৌ-বাহিনীতে নিয়োগ দিয়ে মুঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহ-এর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। বিক্রমপুরের সন্নিকটে সংঘটিত যুদ্ধে কেদার রায় রাজা মানসিংহের হাতে পরাজিত ও নিহত হন।

চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্প নারায়ণ ও রামচন্দ্র

চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি কন্দর্প নারায়ণ বর্তমান বরিশাল ও ঝালকাঠি জেলার একাংশ নিয়ে জমিদারী গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পুত্র রামচন্দ্র পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি রাজা প্রতাপাদিত্যের জামাতা হিসেবে প্রভূত ক্ষমতো ও প্রভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি ভুলুয়ার রাজা লক্ষণ মাণিক্যকে পরাজিত করে নিজের অবস্থানকে সুসংহত করলেও শেষপর্যন্ত স্বাধীনচেতা এ শাসক মুঘল আক্রমণে পরাজিত হন।

ভুলুয়ার লক্ষণ মাণিক্য

সুলতানি শাসনের শেষ দিকে বর্তমান নোয়াখালি ও কুমিল্লার কিছু অংশ নিয়ে যে শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে শাসনের মূল কর্ণধার ছিলেন রাজা লক্ষণ মাণিক্য। বাকলা, আরাকান ও চট্টগ্রামের সাথে ভৌগলিকভাবে যুক্ত থাকায় প্রভাবশালী এ জমিদারির প্রতি মুঘল সম্রাট আকবরের বিশেষ আগ্রহ ছিল। এ জন্য সম্রাট আকবর এখানে আক্রমণ পরিচালনা করে এ জমিদারীকে মুঘল শাসনাধীনে নিয়ে এখানে নৌ-বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করেন এবং এখান থেকে আরাকানের মগ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকাসমূহে শান্তি স্থাপন করেন।

ভূষণার মুকুন্দরাম রায়

বর্তমান ফরিদপুর ও খুলনার কিয়দংশ নিয়ে গঠিত ভূষণা জমিদারীর বিখ্যাত ভূঁইয়া ছিলেন মুকুন্দরাম রায়। তাঁর মৃত্যুর পর রাজা রঘুনাথ এবং রাজা সত্যজিৎ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। কিন্তু এ সময় মুঘল আক্রমণের স্রোতধারায় ভূষণার এ জমিদারগণও পরাজিত হতে বাধ্য হন।

ভাওয়ালের ভূঁইয়াগণ

বর্তমান ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের জমিদারগণ ভাওয়ালের ভূঁইয়া হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এ অঞ্চলের প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন ফজল গাজী। বর্তমান কালিগঞ্জের চৌরা নামক স্থানে তাঁর রাজধানী ছিল। ভাওয়ালের সকল ভূঁইয়া মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন বাহাদুর গাজী। তিনি মুঘল বিদ্বেষী হিসেবে ভূঁইয়া নেতা মুসা খানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে মুঘল সুবাদার ইসলাম খানের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্তু মুঘলদের কাছে মুসা খানের পরাজয় ঘটলে তিনিও মুঘলদের

বশ্যতা স্বীকার করেন। পরবর্তীতে তিনি মুঘলদের পক্ষে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ বংশের আনোয়ার গাজী এবং সোনা গাজী সরাইলের জমিদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ক্রমাগত শক্তিশালী ভূঁইয়াদের পতন ঘটতে থাকলে এরাও মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। অন্যদিকে ফজল গাজীর সমসাময়িক মানিকগঞ্জের স্বাধীন জমিদার চাঁদ গাজীও স্বাধীনভাবে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। তিনিও বীরত্বের সাথে মুঘল বিরোধী জোটে অংশ নেন কিন্তু পরবর্তীতে মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে নেন।

নাটোর, বাঁকুড়া, রাজশাহী ও দিনাজপুরের ভূঁইয়াগণ

নাটোরের কংস নারায়ণ, বাঁকুড়ার বীর হাম্মীর, রাজশাহীর পীতাম্বর রায় এবং দিনাজপুরের প্রমথ রায় তাঁদের যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জমিদার ছিলেন। এ জমিদারদের সকলেই মুঘল বিরোধী জোটে অংশগ্রহণ করে মুসা খানের সাথে একাত্মতা পোষণ করে সুবাদার ইসলাম খানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। কিন্তু বীরত্বের সাথে মুঘল সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেও এ ভূঁইয়াগণ পরাজিত হন।

বার ভূঁইয়াদের চূড়ান্ত পতন

সম্রাট আকবরের সময় থেকে বাংলায় স্বাধীনভাবে শাসনকৃত ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হলে কিছু সাফল্য এলেও চূড়ান্ত সাফল্য আসেনি। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের মৃত্যু হলে সম্রাট জাহাঙ্গীর সিংহাসনে বসে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে সুবাদার ইসলাম খানকে বাংলা অভিযানে প্রেরণ করেন। ইসলাম খান ঘোড়াঘাট হয়ে প্রবেশ করে স্থানীয় ভূঁইয়াদের নিকট থেকে প্রতিরোধের সম্মূখীন হন। কিন্তু তিনি কৃতিত্বের সাথে বার ভূঁইয়া নেতা মুসা খান ও তাঁর সহযোগী শক্তিকে পরাজিত ও নির্মূল করতে সক্ষম হয় এবং ক্রমান্বয়ে রাজা প্রতাপাদিত্য, মীর হাম্মীর, সেলিম খান, রাজা সত্যজিৎ, পীতাম্বর রায় এবং সর্বোপরি এঁদের নেতা মুসা খানকে পরাজিত করে বাংলায় মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে আফগান নেতা উসমানকে পরাজিত করে বোকাইনগর দখল করে নেন। মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়ে খাজা উসমান পালিয়ে শ্রীহট্টের আফগান ভূঁইয়া বায়েজিদের আশ্রয় গ্রহণ করলে তাঁকে পিছু ধাওয়া করে দৌলাম্বপুরে সংঘটিত যুদ্ধে খাজা উসমানকে পরাজিত ও হত্যা করলে ভূঁইয়াদের শক্তি নিঃশেষ এর চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। এরপর ইসলাম খান ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কয়েকটি অভিযান চালিয়ে সকল ভূঁইয়া ও তাঁদের সহযোগীদের চূড়ান্ত পতন ঘটান।

শিক্ষার্থীর কাজ	**বার ভূইঁয়াদের শাসনাঞ্চল চিহ্নিত করে মানচিত্রে নির্দেশ করুন।**

সারসংক্ষেপ :

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে বার ভূঁইয়াদের প্রতিরোধ একটি বিশেষ আলোচিত অধ্যায়। কর্‌রাণী রাজবংশের পতনযুগে এঁরা নিজস্ব জমিদারী প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীনভাবে শাসন কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। কিন্তু ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের জয়ী হয়ে মুঘলরা বাংলায় একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে স্থানীয় এ বারো ভূঁইয়াদের নিকট থেকে মুঘলগণ প্রতিরোধের সম্মূখীন হন। এ প্রতিরোধে ভূঁইয়া নেতা ঈশা খান ও পুত্র মুসা খানের নের্তৃত্বে অধিকাংশ ভূঁইয়াগণ মুঘলদের বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধ গড়ে তোলে কিন্তু সর্ব শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করেও সুবাদার ইসলাম খানের কাছে ভূঁইয়াগণ পরাজিত হলে ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে সমগ্র বাংলার উপর মুঘল আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বার ভূঁইয়াদের নেতা কে ছিলেন?

ক. রাজা অনন্ত মাণিক্য খ. রাজা প্রতাপাদিত্য গ. ঈশা খান ঘ. বাহাদুর গাজী

২. কোন মুঘল সম্রাটের সময় বাংলা চূড়ান্তভাবে মুঘলদের অধীনে আসে?

ক. সম্রাট হুমায়ুন খ. সম্রাট আকবর গ. সম্রাট জাহাঙ্গীর ঘ. সম্রাট আওরঙ্গজেব

৩. মসনদ-ই-আলা কার উপাধি ছিল?

ক. রাজা মানসিংহ খ. ইসলাম খান গ. ঈসা খান ঘ. মুসা খান

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

আলামিন সাহেব একদিন সপরিবারে সোনারগাঁয়ে বেড়াতে গেলেন। তিনি সেখানে অবস্থিত লোকশিল্প জাদুঘর, ঈসা খানের প্রাসাদসহ নানা স্থাপত্যিক স্থাপনা ঘুরে দেখেন। তাঁদের গাইড ফিরোজ প্রতিটি ঐতিহাসিক স্থাপনা ঘুরে দেখিয়ে সেগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বর্ণনা করেন। সেসব বর্ণনা শুনে পুত্র মাহমুদ বলেন নিশ্চয় এ এলাকাটি মধ্যযুগে বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাসনাঞ্চল ছিল।

ক. বারো ভূঁইয়াদের নেতার নাম কি? ১

খ. বারো ভূঁইয়াদের পরিচয় দিন। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঞ্চলে যে শাসকদের শাসনের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের শাসন কার্যক্রম তুলে ধরুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত শাসকদের সাথে মুঘল শাসকদের ধারাবাহিক সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি নির্দেশ করুন। ৪

পাঠ-৬.৪ বাংলায় মুঘল সুবাদারি শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মুঘল সুবাদারি শাসনের ইতিহাস জানতে পারবেন;
- মুঘল সুবাদারদের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- মুঘল সুবাদার ও পর্তুগীজদের মধ্যকার সংঘর্ষ ও এর ফলাফল জানতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**সুবাদার, ইসলাম খান, শায়েস্তা খান ও মুর্শিদ কুলী খান**

মুঘল সুবাদারি শাসন (১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রি.)

বাংলায় বিভিন্ন প্রতিনিধির মাধ্যমে মুঘলদের সরাসরি শাসনকে সুবাদারি শাসন হিসেবে অভিহিত করা হয়। শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যকে কয়েকটি সুবা'য় বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। মুঘল প্রদেশগুলো 'সুবা' নামে পরিচিত ছিল। সুবা প্রধানকে সুবাদার, সাহিব-ই-সুবাহ, নাজিম, ফৌজদার-ই-সুবা প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। বাংলা ছিল মুঘলদের অন্যতম সুবা। বার ভূঁইয়াদের দমনের পর সমগ্র বাংলায় সুবাদারি প্রতিষ্ঠিত হয়। সতের শতকের প্রথম দিক থেকে আঠার শতকের শুরু পর্যন্ত ছিল সুবাদারি শাসনের স্বর্ণযুগ।

রাজমহলের যুদ্ধে জয়ী হয়ে মুঘলরা পুরো বাংলার উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে মনোনিবেশ করে। এ লক্ষে সম্রাট জাহাঙ্গীর সুবাদার ইসলাম খান চিশতিকে (১৬০৮-১৬১৩ খ্রি.) বাংলার সুবাদার হিসেবে নিয়োগ দিলে সুবাদার ইসলাম খান ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে বার ভূঁইয়াদের দমন করে সমগ্র বাংলায় সুবাদারি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাকে বাংলা সুবার রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন। ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর সুবাদার কাশিম খান চিশতি (**১৬১৩-১৬১৭ খ্রি.**) বাংলার শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এরপর দিল্লির সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভাই ইব্রাহিম খান ফতেহ জঙ্গ (১৬১৭-১৬২৪ খ্রি.), দারার খান (১৬২৪-১৬২৫ খ্রি.), মহব্বত খান (১৬২৫-১৬২৬ খ্রি.), মুকাররম খান (১৬২৬-১৬২৭ খ্রি.) এবং ফিদাই খান (১৬২৭-১৬২৮ খ্রি.) দায়িত্ব পালন করেন।

সম্রাট শাহজাহান ক্ষমতা গ্রহণ করার পর ১৬২৮খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবাদার হিসেবে কাসিম খান জুয়িনীকে (১৬২৮-১৬৩২ খ্রি.) নিয়োগ করেন। হুসেন শাহী যুগ হতেই বাংলায় পর্তুগীজরা বাণিজ্য করত। এ সময় পর্তুগীজ বণিকদের প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায়। ক্রমে তা বাংলার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। কাসিম খান জুয়িনী শক্ত হাতে পর্তুগীজদের দমন করেন। এরপর সুবাদার আজম খান (১৬৩২-১৬৩৫ খ্রি.) বাংলার সুবাদার হিসেবে নিয়োগ পান। এরপর সুবাদার ইসলাম খান মাসহাদী (১৬৩৫-১৬৩৯ খ্রি.) চার বছর বাংলা শাসন করেন। অতঃপর শাহজাহান তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজাকে বাংলার সুবাদার হিসেবে নিয়োগ দেন। সুজা কুড়ি বছর দায়িত্বে ছিলেন। যুবরাজ শাহ সুজার শাসনকাল মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ছিল। বিদেশি বণিক গোষ্ঠির মধ্যে ইংরেজরা এ সময় সুবাদারের কাছ থেকে কিছু বাড়তি সুবিধা লাভ করছিল। এতে বাণিজ্যের পাশাপাশি ইংরেজদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর চার পুত্রের প্রত্যেকেই সম্রাট হওয়ার জন্য বিদ্রোহ করে। এ সময় আওরঙ্গজেবের সাথে শাহ সুজার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। দুই ভাইয়ের যুদ্ধে ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে শাহ সুজা পরাজিত হন। পরাজিত হয়ে তিনি আরাকানে পলায়ন করেন এবংসেখানে সপরিবারে নিহত হন।

উত্তরাধিকার যুদ্ধে জয়ী হতে আওরঙ্গজেব সেনাপতি মীর জুমলাকে বাংলায় শাহ সুজাকে দমন করার জন্য প্রেরণ করলে মীর জুমলা রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর পর্যন্ত এসেছিলেন। সম্রাট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর আওরঙ্গজেব মীর জুমলাই (১৬৬০-১৬৬৩ খ্রি.) বাংলার সুবাদারের দায়িত্ব দেন। সুবাদার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে মীর জুমলা অহোমরাজের বিরুদ্ধে অভিযান চালনা করেন। এক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত না হলেও কুচবিহার ও আসাম বিজয় মীর

জুমলা সামরিক প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। তাঁর সময়েই কুচবিহার সম্পূর্ণরূপে প্রথমবারের মতো মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। আসাম অভিযানের দ্বারা তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের সীমান্ত আসাম পর্যন্ত বর্ধিত করেন।

মীর জুমলার মৃত্যুর পর প্রথমে দিলির খান (১৬৬৩ খ্রি.) ও পরে দাউদ খান (১৬৬৩-১৬৬৪ খ্রি.) অস্থায়ী সুবাদার হিসেবে বাংলা শাসন করেন। অতঃপর আওরঙ্গজেব তাঁর মামা শায়েস্তা খানকে (১৬৬৪-১৬৮৮ খ্রি.) বাংলার সুবাদার নিয়োগ দেন। দুই দফায় তিনি প্রায় ২৩ বছর বাংলা শাসন করেন এর মাঝে ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট তাঁকে কিছুদিনের জন্য দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। শায়েস্তা খান ছিলেন একজন সুদক্ষ সেনাপতি ও দূরদর্শী শাসক। তিনি মগদের উৎপাত হতে বাংলার জনগণের জানমাল রক্ষা করেন। তিনি সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রাম অধিকার করে আরাকানী জলদস্যুদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করেন। সুবাদার শায়েস্তা খান কুচবিহার, কামরূপ, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে মুঘল শাসন সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সীমান্তএলাকার নিরাপত্তারও ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর ভয়ে আসামের রাজা মুঘলদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে সাহস পাননি। সুবাদারির শেষ দিকে শায়েস্তা খানের সাথে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধ বাঁধে। ইংরেজদের ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পেতে থাকে যে তারা ক্রমে এদেশের জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দেয়। দীর্ঘদিনের চেষ্টার পর শায়েস্তা খান বাংলা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন। শায়েস্তা খানের পর একে একে খান-ই-জাহান বাহাদুর (১৬৮৮-১৬৮৯ খ্রি.), ইব্রাহিম খান(১৬৮৯-১৬৯৮ খ্রি.) ও আজিমুদ্দিন (১৬৯৮-১৭১২ খ্রি.) বাংলার সুবাদার হন। তাঁদের সময় বাংলার ইতিহাস তেমন ঘটনাবহুল ছিলনা। শায়েস্তা খান তাঁর শাসন আমলের বিভিন্ন জনহিতকর কার্যাবলীর জন্য স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তাঁর সময়ে সাম্রাজ্যের সর্বত্র অসংখ্য সরাইখানা, রাস্তা ও সেতু নির্মিত হয়েছিল। দেশের অর্থনীতি ও কৃষি ক্ষেত্রে তিনি অভাবিত সমৃদ্ধি আনয়ন করেছিলেন। জনকল্যাণকর শাসনকার্যের জন্য শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সময়ে দ্রব্যমূল্য সস্তা ছিল টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত।

সুবাদার শায়েস্তা খান

শায়েস্তা খানের আমলে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূলে ছিল শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার। এ আমলে কৃষিকাজের সঙ্গে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। শায়েস্তা খান ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশী বণিকদের বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান করতেন। শায়েস্তা খানের শাসনকাল বাংলার স্থাপত্য শিল্পের জন্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিচিত্র সৌধমালা, মনোরম সাজে সজ্জিত তৎকালীন ঢাকা নগরী স্থাপত্য শিল্পের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের সাক্ষ্য বহন করে। স্থাপত্য শিল্পের বিকাশের জন্য এ যুগকে বাংলায় মুঘলদের 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে অভিহিত করা যায়। তাঁর আমলে নির্মিত স্থাপত্য কার্যের মধ্যে ছোট কাটরা, লালবাগ কেল্লা, পরী বিবির সমাধি-সৌধ, হোসেনি দালান, সুফি খানের মসজিদ, বুড়িগঙ্গার মসজিদ, চক মসজিদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মোটকথা, অন্য কোনো সুবাদার বা শাসনকর্তা ঢাকায় শায়েস্তা খানের ন্যায় নিজের স্মৃতিকে এতো বেশি জ্বলন্ত রেখে যেতে পারেননি।

দক্ষ সুবাদার হিসাবে এবার বাংলার ক্ষমতায় আসেন মুর্শিদ কুলী খান (১৭০০-১৭২৭খ্রি.)। সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রথমে তাঁকে বাংলার দিউয়ান হিসেবে নিয়োগ দেন। দিউয়ানের কাজ ছিল সুবার রাজস্ব আদায় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা। সম্রাট ফখরুখ শিয়ারের রাজত্বকালে মুর্শিদ কুলী খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। মুর্শিদ কুলী খান যখন বংলায় আগমণ করেন তখন বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। এ পরিস্থিতির মুখে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বাংলায় মুঘল শাসন পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। স্বীয় ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা তিনি বাংলার ইতিহাসের গতিকে পরিবর্তিত করেছিলেন। সম্রাট আওঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দুর্বল মুঘল সম্রাটগণ দূরবর্তী সুবাগুলোর দিকে তেমন দৃষ্টি দিতে পারেননি। ফলে এসব অঞ্চলের সুবাদারগণ অনেকটা স্বাধীনভাবে শাসন করেন। মুর্শিদ কুলী খানও অনেকটা স্বাধীন হয়ে পড়েন। তিনি নামমাত্র সম্রাটের আনুগত্য প্রকাশ করতেন এবং দিল্লিতে বার্ষিক ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব পাঠাতেন। মুর্শিদ কুলী খানের পর তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন খান বাংলার সিংহাসনে বসেন। এভাবে বাংলার সুবাদারি বংশগত হয়ে পড়ে। আর এই পথ ধরে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলার স্বাধীন নবাবী শাসন।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলার মুঘল সুবাদারদের একটি তালিকা প্রণয়ন করুন।

সারসংক্ষেপ :

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে মুঘল সুবাদারি শাসন এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। বার ভূঁইয়াদের দমনের পর বাংলায় দীর্ঘদিন ধরে এ সুবাদারি শাসন চালু ছিল। এ সময় বাংলায় শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় ছিল। সুবাদার শায়েস্তা খানের সময় এক টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত। মুঘলদের সাথে পর্তুগীজদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং কুচবিহার ও আরাকানের সাথে সম্পর্ক এ সময়কার একটি বিশেষ উল্লেখ্য ঘটনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ঢাকাকে কত সালে বাংলার রাজধানী করা হয়?
ক. ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে গ. ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে

২। কোন সুবাদার পর্তুগীজদের দমন করতে সমর্থ হন?
ক. সুবাদার ইসলাম খান খ. সুবাদার কাসিম খান জুয়িনী গ. সুবাদার শায়েস্তা খান ঘ. সুবাদার মীর জুমলা

৩। পরী বিবির সমাধি কোথায় অবস্থিত?
ক. ছোট কাটরায় খ. বড় কাটরায় গ. ঈমাম বাড়ায় ঘ. লালবাগের কেল্লায়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

রনি ও সোমা টিভি দেখছিল। টিভিতে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থাপনা বিষয়ে অনুষ্ঠান চলছিল। এ সময় লালবাগের কেল্লা বিষয়ে একটি প্রতিবেদন শুরু হয়। প্রতিবেদক বলেন, এটি মুঘল শাসনামলের একটি স্থাপত্য নিদর্শন। মুঘলরা বাংলায় শাসন প্রতিষ্ঠার পর ঢাকাকে রাজধানী ঘোষণা করে। লালবাগের কেল্লাকে দুর্গ কেন্দ্র করে বাংলায় দীর্ঘদিন মুঘল শাসন চালু রেখেছিল।

ক. মুঘল প্রদেশগুলো কি নামে পরিচিত ছিল? ১
খ. সুবা বাংলার শাসন বলতে কী বুঝ? ২
গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত শাসকবর্গ কিভাবে বাংলায় মুঘলদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেন তা তুলে ধরুন। ৩
গ. "মুঘল বাংলা সমৃদ্ধিশালী ছিল"- ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে মন্তব্যটি পর্যালোচনা করুন। ৪

পাঠ-৬.৫ মুঘল সুবাদারি শাসনামলে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মুঘল সুবাদারি শাসনামলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- মুঘল সুবাদারি শাসনামলে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন ও
- বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে মুঘল সুবাদারদের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**মসলিন, তাজিয়া, দরগাহ ও টোল**

বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা

বাংলায় সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হতে থাকে। এরই ধারায় সুলতানি শাসনামলে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবণ ঘটলে এর অর্থনৈতিক অবস্থাও সমৃদ্ধ হয়। এমতাবস্থায় বাংলায় আফগান শাসন পেরিয়ে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের পর মুঘল সুবাদারি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এর আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রেও নবজোয়ার সৃষ্টি হয়।

অর্থনৈতিক অবস্থা

নদীমাতৃক বাংলার ভূমি চিরদিনই প্রকৃতির অকৃপণ আশীর্বাদে পরিপুষ্ট। এখানকার কৃষিভূমি অস্বাভাবিক উর্বর। মুঘল সুবাদারি শাসনামলে এখানকার উৎপন্ন ফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ধান, গম, তুলা, রেশম গুটি, ইক্ষু, ভুট্টা, পাট, আদা, জোয়ার, সিম, তিল, তিষি, সরিষা ও ডাল। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে পিঁয়াজ, রসুন, হলুদ, শশা প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। আম, কাঁঠাল, কলা, মোসাব্বর, খেজুর ইত্যাদি ফলমূলের ফলনও ছিল প্রচুর। পান, সুপারি, নারকেলও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। গালা বা দ্রাক্ষাও উৎপন্ন হতো প্রচুর। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এসব পণ্য বাংলার বাইরেও রপ্তানি হতো। বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল উৎস ছিল কৃষি। কৃষি ফলনের প্রাচুর্য থাকলেও এ সময়ের চাষাবাদ পদ্ধতি ছিল অনুন্নত। আধুনিক সময়ের মতো পানি সেচ ব্যবস্থা সে যুগে ছিলনা। কৃষককে অধিকাংশ সময়েই সেচের জন্য বৃষ্টির উপর নির্ভর করতে হতো। খরার বিরুদ্ধে তাদের করার কিছুই ছিল না। কৃষি প্রধান দেশ বলে বাংলার অধিবাসীর বৃহত্তর অংশ ছিল কৃষক। বাংলার মাটিতে কৃষিজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য ছিল। ফলে উদ্বৃত্ত বিভিন্ন পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হতো। এ ব্যবসায়িক তৎপরতা কালক্রমে শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়।

সমকালীন বিভিন্ন বর্ণনায় জানা যায় যে, এ সময় কৃষি পণ্যকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনগণ, শাসক ও অভিজাতবর্গের চাহিদা পূরণের জন্য বস্ত্র শিল্প, লবণ শিল্প, রেশম শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, মুদ্রা শিল্প, চিনি শিল্প, কাগজ শিল্প, স্থাপত্য শিল্প, তেল শিল্প, অস্ত্র শিল্প, অলংকার শিল্প, কাঠ শিল্প সহ নানা ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন ও উৎপাদন হয়েছিল। এ সময় বাংলার বস্ত্র শিল্পের অগ্রগতি ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার নির্মিত বস্ত্রগুলো গুণ ও মানের বিচারে যথেষ্ট উন্নত ছিল। তাই বিদেশে এগুলোর প্রচুর চাহিদা ছিল। নিজেদের ব্যবহারের জন্য রঙিন কাপড় এবং বিদেশে রপ্তানি করার জন্য সাদা কাপড় এখানে তৈরি করা হতো। ঢাকা ছিল মসলিন নামক বিশ্বখ্যাত সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্পের প্রধান প্রাণকেন্দ্র। ইউরোপে এর প্রচুর চাহিদা ছিল। এ বস্ত্র এতই সূক্ষ্ম ছিল যে ২০ গজ মসলিন কাপড় একটি কৌটায় ভরে রাখা যেত। পাট ও রেশমের সাহায্যে বস্ত্র তৈরিতে বাংলার কারিগররা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। মুঘল শাসকদের উদার পৃষ্টপোষকতায় বাংলায় চিনি ও গুড় তৈরি এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। মধ্যযুগে বাংলার রকমারি ক্ষুদ্র শিল্পের কথা জানা যায়। এ প্রসঙ্গে ধাতব শিল্পের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তখন লৌহ নির্মিত দ্রব্যাদির ব্যাপক প্রচলন ছিল। কর্মকারগণ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণ করত। এছাড়া দুধারী তরবারি, ছুরি, কাঁচি, কোদাল ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য ধাতব দ্রব্য তৈরি হতো। কলকাতা ও কাশিম বাজারে এদেশের লোকেরা কামান তৈরি করত। কাগজ, গালিচা, ইস্পাত প্রভৃতি শিল্পের কথাও জানা যায়।

ধর্মীয় অবস্থা

বর্তমানকালের মতো সুবাদারি শাসনামলেও বাংলার অমুসলিমরা বিভিন্ন ধর্মীয় রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করত। আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সাথে হিন্দুরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করত। এঁদের মধ্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, শিব, শিবলিঙ্গ, চণ্ডী, মনসা, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, সূর্য, মদন, নারায়ণ, ব্রহ্ম, অগ্নি, শীতলা, ষষ্ঠী, গঙ্গা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাঙালি হিন্দুর সামাজিক জীবনে দুর্গা পূজা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দুরা দশহরা, গঙ্গা স্নান, অষ্টমী স্নান এবং মাঘী সপ্তমী স্নানকে পবিত্র বলে মনে করত। ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের নিকট গঙ্গার জল ছিল অত্যন্ত পবিত্র। তারা দোলযাত্রা, রথযাত্রা, হোলি ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসব পালন করত। জাতিগত শ্রেণিভেদ ছাড়াও হিন্দু সমাজে কতকগুলো ধর্মীয় সম্প্রদায় ছিল। যেমন শৈব, শাক্ত ইত্যাদি। হিন্দু জাতির মধ্যে এ সময় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবও উল্লেখযোগ্য ছিল। এ সময়ে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির অভাব ছিল। এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের বিরোধ ও বিদ্বেষ অতি পরিচিত ঘটনা ছিল।

মুসলমানরাও বর্তমান সময়ের মতো বিভিন্ন ধর্মীয় রীতি-নীতি ও আচার অনুষ্ঠান পালন করত। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা মুসলমান সমাজের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হিসেবে পালিত হতো। ধর্মপ্রাণ মুসলমান মাত্রই পবিত্র রমজান মাসে রোজা রাখা এবং শব-ই-বরাতের দিন এবাদত বন্দেগীতে রাত্রীযাপন করত। উৎসব অনুষ্ঠানে মুসলমানগণ তাদের সাধ্যমত নতুন এবং পরিচ্ছন্ন পোশাকে সজ্জিত হতো; একে অন্যের গৃহে গিয়ে কুশল ও দাওয়াত বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের সৌহার্দ্যও ভ্রাতৃত্বভাবকে সুদৃঢ় করত। সুবেদারগণ ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে জনগণের সান্নিধ্যে আসতেন। বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে মুসলমানগণ মুহাম্মদ (স.) এর জন্মদিন পালন করতেন। বর্তমান সময়ের ন্যায় সুবাদারি শাসনামলেও মহর্‌রম উৎসব পালিত হতো। শিয়া সম্প্রদায়ের একটি প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে এটি পরিচিত ছিল। এ দিবসে শিয়ারা 'তাজিয়া' তৈরি ও মহর্‌রমের মিছিল আয়োজন করত। মুসলমানদের বর্ষপঞ্জী অনুসারে মহর্‌রমের প্রথম দিনকে নববর্ষ হিসেবে পালন করা হয়। মহর্‌রমের চন্দ্র উদয়কে মুসলমানগণ আনন্দ ও উৎসবের সঙ্গে বরণ করত।

এ যুগে ধর্মপ্রীতি মুসলমান সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। এছাড়া, তারা নিয়মিত কোরআন ও হাদিস পাঠ করতেন। সমাজে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হতো। ছেলে মেয়ে উভয়কেই ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য মক্তবে প্রেরণ করা হতো। সমাজে ধর্মীয় জ্ঞানের জন্য এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনার জন্য মোল্লা সম্প্রদায়কে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হতো। বিভিন্ন ব্যাপারে এবং অনেক সমস্যা সমাধানে মোল্লাগণ কোরান-হাদিসের নির্দেশ অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করতে উপদেশ প্রদান করতেন। গ্রামীণ জীবনে ধর্মীয় উৎসবাদিতে এবং বিয়ে-শাদির মতো সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে মোল্লা সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। মুসলমান সমাজে সুফি ও দরবেশ নামে পরিচিত পীর বা ফকির সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাঁরা ধর্মশাস্ত্রে সু-পণ্ডিত ছিলেন এবং সর্বদা আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁরা ধর্ম সাধনার জন্য 'দরগাহ' প্রতিষ্ঠা করেন। শাসকবর্গ ও জনগণ সকলের কাছেই তাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বাংলায় ইসলামের বিস্তৃতির সাথে সাথে মুসলমান সমাজও বিস্তৃত হতে থাকে। বাংলায় মুসলমান সমাজে দুটি পৃথক শ্রেণি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একটি বিদেশ হতে আগত মুসলমান, অন্যটি স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমান। বিদেশী ও স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে কৃষ্টি ও রীতি-নীতির পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দেয়নি। মুসলমান শাসকদের উদারতা এবং স্থানীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের উদার পৃষ্ঠপোষকতাই এর কারণ।

ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষা

মুঘল যুগে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। তবে মুঘল শাসকগণ সুলতানি যুগের শাসকদের ন্যায় ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষকোনো সহযোগিতা করেন নি। বাংলার জমিদারগণ স্বীয় প্রচেষ্টায় সে ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। মুসলমান যুগে প্রতিবেশি আরাকানের সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল। ফলে আরাকানে বাংলা সাহিত্যের প্রসার ঘটতে শুরু করে। আরাকান রাজসভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন দৌলত কাজী। আলাওল ছিলেন রাজসভার আর একজন কবি। তাঁর ছয়টি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'পদ্মাবতী' সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কয়েকটি ফারসি কাব্য গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। এছাড়া, 'রাগমালা' নামে একটি সঙ্গীত শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন। বাহরাম খান রচনা করেন 'লাইলি-মজনু' কাব্য গ্রন্থ। 'জঙ্গনামা' ও 'হিতজ্ঞান বাণী' গ্রন্থগুলো কবি কাজী হায়াৎ মাহমুদ রচিত। কবি শাহ গরীবুল্লাহ ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ পুঁথি সাহিত্যিক। বাংলার মুসলামন শাসন কেবল রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়,

শিক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। বাংলায় মুসলমান শাসনকালে শিক্ষার দ্বার হিন্দু-মুসলমান সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। শেখদের খানকাহ ও উলেমাদের গৃহ শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। মুসলমান শাসনের সময় বাংলার সর্বত্র অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এ সকল মসজিদের সঙ্গেই মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল। মক্তব ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করত। বালক-বালিকারা একত্রে মক্তব ও পাঠশালায় লেখাপড়া করত। প্রাথমিক শিক্ষা সকল মুসলমান বালক-বালিকার জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। তবে স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ প্রচলন ছিল না। মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণও মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল না। ফলে সাধারণ মুসলমান মেয়েরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ হতে বঞ্চিত ছিল। শাসকবর্গের ভাষা ছিল ফারসি। ফলে এ ভাষা প্রায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করেছিল। নবাব ও মুসলমান অভিজাতবর্গ ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। সরকারি চাকরি লাভের আশায় অনেক হিন্দু ফারসি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতেন। মুসলমান শিক্ষকগণ ফার্সি ও আরবি ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। এ যুগে বাংলা ভাষা বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। আরবি ও ফার্সি ভাষায় অজ্ঞ সাধারণ মুসলমানেরা যেন ইসলামের ধ্যান-ধারণা বুঝতে পারে সেজন্য অনেকেই বাংলা ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করেন। তাঁদের রচনাবলী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

মুসলমান শাসনের পূর্বে বাংলার হিন্দু সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। মুসলমানদের শাসন-ব্যবস্থায় হিন্দু সমাজের সকল শ্রেণির জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। পাঠশালায় হিন্দু বালক-বালিকারা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করত। গুরুর আবাসস্থল কিংবা বিত্তবানদের গৃহে পাঠশালা বসত। কখনও কখনও একই ঘরের চালার নিচে মক্তব ও পাঠশালা বসত। সকালে মুন্সি মক্তবের শিক্ষার্থীদের এবং বিকালে গুরু তার ছাত্রদের পাঠশালায় শিক্ষাদান করতেন। বিত্তবান লোকেরা পাঠশালার ব্যয়ভার গ্রহণ করতেন। হিন্দু বালক-বালিকারা একত্রে পাঠশালায় শিক্ষা গ্রহণ করত। ৬ বছর পর্যন্ত পাঠশালায় শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য 'টোল' ছিল। সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো। সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার জন্য নবদ্বীপ, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানের নাম উল্লেখযোগ্য ছিল। অনেক মহিলা এ যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃত চর্চার ক্ষেত্রে নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণি সর্বদা নিজেদের জ্যোতিষশাস্ত্রও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত থাকতেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এ যুগে সমাজে জনগণের মধ্যে জ্ঞান ও বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশের জন্য কতগুলো সাধারণ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, যেমন– ধর্মীয় সঙ্গীত, জনপ্রিয় লোক-কাহিনী ও নাটক- গাঁথা।

শিক্ষার্থীর কাজ	**মুঘল শাসনামলে বাংলার অর্থনৈতিক পণ্যের একটি তালিকা তৈরি করুন।**

সারসংক্ষেপ :

মুঘল সুবাদারি শাসনামলে বাংলা কেন্দ্রের অধীনে থাকলেও এর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন গতিলাভ হয়েছিল। এ সময় নানা অর্থনৈতিক পণ্য উৎপাদন যেমন হয়েছিল তেমনি স্থানীয় পণ্যের উৎকর্ষতার সুযোগে এর অভ্যন্তরীণ ও বর্হিবাণিজ্যও প্রসারিত হয়েছিল। একই সাথে স্থানীয় উৎপাদিত পণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে এর শিল্প বিকশিত হয়েছিল। এছাড়া জনজীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি থাকায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। এ সময় সকল ধর্মালম্বী ব্যক্তিবর্গ স্বাধীনভাবে স্ব স্ব ধর্ম পালন করতে পারতেন। ফলে বাঙালি সমাজে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মধ্যযুগে বাংলার অর্থনীতির প্রধান উৎস ছিল কোনটি?

ক. বাণিজ্য খ. কৃষি গ. শিল্প ঘ. প্রকৃতিক সম্পদ

২। বাংলার উৎপাদিত কোন দ্রব্যের বিদেশে খুব চাহিদা ছিল?

ক. খাদ্যদ্রব্য খ. শৌখিন দ্রব্য গ. বস্ত্র ঘ. আফিম

৩। বিখ্যাত মসলিন বস্ত্র কোথায় তৈরি হত?
ক. ত্রিপুরা খ. যশোর গ. চট্টগ্রাম ঘ. ঢাকা

৪। কোন শাসকরা বাংলার জাহাজ নির্মাণ শিল্পের প্রসারে অবদান রাখেন?
ক. মুঘলরা খ. হোসেনশাহীরা গ. পাঠানরা ঘ. বার ভুঁইয়ারা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে নিজস্ব সাংস্কৃতিক জাগরণের জন্য নানা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয় যা অদ্যাবধি চলমান। এ আন্দোলন শুধু সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য নয় এটি মূলত বাংলার আর্থ-সামাজিক মুক্তির একটি আন্দোলন। এ আন্দোলনকারীরা দাবী করেন বাংলা ইংরেজদের আবির্ভবের পূর্বে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে উন্নত ছিল এবং ঐ সময় বাংলায় নানা সাহিত্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল।

ক. বাংলার বিখ্যাত বস্ত্রের নাম কি? ১
ক. মুঘল সুবাদারি শাসনে বাংলা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সময়কালে বাংলার ধর্মীয় পরিবেশের উল্লেখপূর্বক ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মুঘল সুবাদারি শাসনামলের বাংলার সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লিখুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ : ১. ক ২. খ ৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ : ১. ক ২. ঘ ৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ : ১. গ ২. গ ৩. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪ : ১. খ ২. খ ৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫ : ১. খ ২. গ ৩. ঘ ৪. ক